98.8K L 9 LD157K n/a whois source Rank829K PIN 0 8 63 n/a

সম্পাদকীয়

যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে

মর্ডিকাই কুর্জ

প্রকাশ: শুক্রবার ৬ জুন ২০২৫, ০২:৪৪

ছবি: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

গণতন্ত্রের এভাবে পিছিয়ে পড়ার পেছনে দুটি শক্তি কাজ করেছে। প্রথমটি হলো তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব, যার মধ্য দিয়ে সত্তরের দশকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর দ্বিতীয়টি হলো ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান প্রশাসনের শুরু করা মুক্তবাজারকেন্দ্রীক নীতিমালা।

বৈশ্বিক গণতন্ত্রের পশ্চাদমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে অন্তত এক দশক ধরে। আর যুক্তরাষ্ট্রকে এখন বৈশ্বিক এ সংকটের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসা এবং হোয়াইট হাউসে তার বিশৃঙ্খল প্রথম কয়েকটি মাস। কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টির বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনের সুচনালগ্ন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ারও জোর সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের এমন কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঘুরে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত রীতিমতো বিশ্লেষণের বন্যা বয়ে গেছে। আর এসব বিশ্লেষণের বক্তব্যও সহজেই অনুমেয়, যেখানে অনেকেই মার্কিন কর্মজীবীদের কাছ থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াকে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন।

কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে জাতিগত বিভেদ, গর্ভপাত বা তথাকথিত 'ওক আইডোলোজির' (সামাজিক বৈষম্যবিরোধী মতাদর্শ) মত সাংস্কৃতিক কিছু বিষয় কাজ করেছে। অন্য অনেকের মতে, মার্কিন রাজনীতিতে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভেঙে পড়েছে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি। আর অর্থনৈতিক নীতিগুলো হয়ে উঠেছে কেবল ধনীদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার।

যদিও এসব অভিমতের মধ্যে প্রকৃত পরিস্থিতির কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলোতো কেবল ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের লক্ষণের মাত্র। এসব বিশ্লেষণে প্রকৃত সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত হচ্ছে না বা এর সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। কী কারণে মার্কিন রাজনীতিতে নাগরিক কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে পড়ল? কী কারণে এখানকার অর্থনীতি শুধু ধনীদেরই স্বার্থকে রক্ষা করছে? অন্যদের স্বার্থকে নয় কেন? যদি আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারি, তবে আমাদের পক্ষে গণতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা পুনরুদ্ধারে সুসংগঠিত কোনো নীতিগত রোডম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে না।

সম্পাদকীয় থেকে আরো পড়ুন

বাজেট প্রতিক্রিয়া • উচ্চ মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে আঁটসাঁট বাজেট প্রস্তাবই কাঙ্ক্ষিত ছিল

দেশজুড়ে কভিড নিয়ে সতর্কতা, ভারত ভ্রমণ না করার পরামর্শ • সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে

অভিমত • নতুন রাজনৈতিক শক্তির পররাষ্ট্রনীতি ও ত্রিশক্তির কূটনৈতিক সমীকরণ

স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি: বৈধতা, বৈষম্য ও টেকসই অর্থনীতির সংকট

পারিবারিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রসংস্কার: ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের পথরেখা

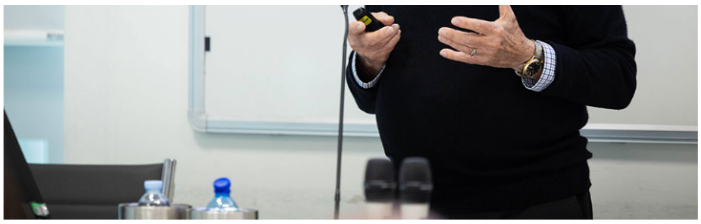

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মর্ডিকাই কুর্জ

গণতন্ত্রের এভাবে পিছিয়ে পড়ার পেছনে দুটি শক্তি কাজ করেছে। প্রথমটি হলো তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব, যার মধ্য দিয়ে সত্তরের দশকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর দ্বিতীয়টি হলো ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান প্রশাসনের শুরু করা মুক্তবাজারকেন্দ্রীক নীতিমালা। ২০২০ সাল পর্যন্ত রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সব প্রশাসনই এ নীতিমালার প্রতি সমর্থন জানিয়ে গেছে। "ওয়াশিংটন কনসেন্সাস"-এর (অর্থনৈতিক সংকটের মুখে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আশি ও নব্বইয়ের দশকে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ প্রচারিত ও উৎসাহিত উদারীকরণ ও বাজারকেন্দ্রীক ১০টি নীতি) ব্যানারে এটি আবার গোটা বিশ্বে ছড়ানোও হয়েছে।

এ দুইয়ের প্রভাবে খুবই নগণ্যসংখ্যক কিছু মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আবার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ঘটনা যে ইতিহাসে এটিই প্রথম; তা-ও না। যদিও আগেকার ঘটনাগুলোয় দেখা গেছে যে প্রযুক্তির উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কর্মজীবীদের সুবিধা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে এবং তাদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিগত চারটি দশকের ঘটনা পুরোপুরি ভিন্ন। এ সময়ের মধ্যে প্রযুক্তিগত ও নীতিগত যেসব পরিবর্তন এসেছে, তা স্বল্পশিক্ষিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোকে রীতিমতো ধ্বংস করেছে। যদিও মার্কিন শ্রমশক্তির ৬২ শতাংশই গড়ে উঠেছে স্বল্পশিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে।

গণতন্ত্রের এভাবে ক্ষয়ে যাওয়ার পেছনে যেহেতু অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক বিষয়গুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে; সেহেতু এ পরিস্থিতিকে বদলাতে হলে জননীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম কয়েকটি মাসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি— যিনি কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, বরং উচ্চপ্রযুক্তি খাত থেকে আসা এক অলিগার্ক; নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পাশে তার হাস্যোজ্জ্বল ছবি এ বাস্তবতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

একচেটিয়া ক্ষমতার দায়হীন ব্যবহার

মার্কিন অর্থনীতি বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এ কথা সবাই জানে। কিন্তু এ সম্পদের উৎপত্তি হলো কীভাবে? ২০২৩ সালে প্রকাশিত বই 'দ্য মার্কেট পাওয়ার অব টেকনোলজি: আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সেকেন্ড গিল্ডেড এইজ'— এ আমি দেখিয়েছি, কীভাবে উদ্ভাবন ও নতুন প্রযুক্তি অর্থনৈতিক অগ্রগতির উৎস হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বাজারে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির পথ তৈরি করে। অর্থাৎ, কোনো প্রতিষ্ঠান যখন তাদের পণ্যের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রির ক্ষমতা পেয়ে যায়, তখনই সেটি একচেটিয়া মুনাফা পেতে থাকে। কোনো উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রযুক্তির মালিকানা দেয়া হলে প্রতিযোগীরা সে একই প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারে না। ফলে ওই প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। এ একচেটিয়া অধিকারকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এমন যেকোনো পণ্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেটি উৎপাদনে ওই প্রযুক্তির মালিকানা প্রয়োজন।

আমার বিশ্লেষণ হলো মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতির অধীনে প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবকদের বাজার নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা দেয়া হয়, তা পরে ওই অর্থনীতির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রযুক্তির দৌড়ে যে উদ্ভাবকেরা জিতে যায়, নানা কৌশল ব্যবহার করে নিজেদের প্রাথমিক সাফল্যকে স্থায়ী করে ফেলে একই সঙ্গে নিজেদের বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে আরো পাকাপোক্ত করে তোলে।

এক্ষেত্রে তারা প্রযুক্তিকে আরো উন্নত বা হালনাগাদ করার বিষয়টিকে কাজে লাগাতে পারে। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান আগেকার একটি পেটেন্টের মাধ্যমে পাওয়া একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণের সময়সীমাকে বাড়িয়ে নিতে হালনাগাদকৃত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি পেটেন্ট ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের স্কেল ইকোনমি (ব্যাপক আকারে উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনার সুবিধা) এবং নেটওয়ার্ক ইফেক্টের (ব্যবহারকারী ও গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য বা সেবার ভ্যালু বেড়ে যাওয়া) সুবিধা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এমন সুবিধা পাওয়া বাজারে নতুন প্রবেশকারীদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। এছাড়া বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগী বা তাদের প্রযুক্তিগুলোকে অধিগ্রহণ করে নিতে পারে। তারা গ্রাহক এবং সরবরাহকারীদের এমন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যেখানে প্রতিযোগীদের প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান নিজের ক্ষতি স্বীকার করে হলেও বাজারে কমদামে পণ্য ছাড়া, বানোয়াট মামলা-মোকদ্দমা, জনপরিসরে অপপ্রচার বা সরবরাহ চেইনে হস্তক্ষেপের মতো সুক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের জন্য চ্যালেঞ্জও তৈরি করতে পারে।

উপরন্তু, অ্যান্টিট্রাস্ট আইন থেকে কোনো ছাড় পেলে একচেটিয়া ব্যবসা করে যাওয়া প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতা বাড়ানো আরো সহজ হয়ে যায় যায়। কথা ছিল, এ ধরনের অব্যাহতি অ্যান্টিট্রাস্ট এবং পেটেন্ট আইনের মধ্যের দ্বন্দ্বকে দূর করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়। কারণ বেশিরভাগ একচেটিয়া ক্ষমতার উৎস হলো প্রযুক্তি। আর বেশিরভাগ ব্যবসায়িক উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো একচেটিয়া মুনাফা অর্জন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সিলিকন ভ্যালি থেকে বারবার নানা ধরনের 'ব্যাঘাত ঘটার' যে বক্তব্য আসে, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় হলো প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে দূর করে না। এ বিষয়ে যাবতীয় গবেষণা থেকে যে উপসংহার পাওয়া যায় তা হলো বাজারে একচেটিয়া অবস্থানে থাকা প্রযুক্তিগত যেকোনো প্রতিষ্ঠান তার বাজার হিস্যাকে যেভাবেই হোক রক্ষা করবে। আর খুব কম ক্ষেত্রেই এটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। আবার প্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতার পরিবর্তে প্রায়শই যৌথ প্রকল্প হাতে নেয় বা গবেষণা ও উন্নয়নের দায়িত্ব ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ছেড়ে দিয়ে সেগুলোকে সহযোগিতা করতে থাকে। এক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিগ্রহণ করে নেয়া হয়।

আদতে সিলিকন ভ্যালির প্রায় **প্রতিটি স্টার্টআপের শুরু থেকেই পরিকল্পনা থাকে যে তারা তাদের নতুন**

আইডিয়াকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত উন্নত করবে এবং এর পর কোনো শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি তাদের অধিগ্রহণ করে নেবে। এ ধরনের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় উঠে আসে যে দাম নিয়ন্ত্রণ অবৈধ হলেও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অবৈধ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ওপেনএআইয়ের কথা। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সফটওয়্যার শিল্পের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রতিযোগী হয়ে ওঠার জোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা করার বদলে ওপেনএআই মাইক্রোসফটের কাছ থেকে ১৩ বিলিয়ন ডলারে বিনিয়োগ নিশ্চিত করে এবং নিজের চেয়েও বহুগুণ বড় কোম্পানির একটি অংশীদারে পরিণত হয়। অন্য সব নতুন এআই কোম্পানিগুলোও এখন ঠিক একই পথে হাটছে।

প্রতিযোগিতাহীনতা

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর মধ্যেকার এ মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আজকের মাল্টিট্রিলিয়ন ডলার কোম্পানিগুলোর উত্থানকে ব্যাখ্যা করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিগ্রহণ করে নেয়ার উচ্চহারের মধ্য দিয়ে তাদের একাধিক প্রযুক্তিকে জুড়ে দিয়ে বিস্তৃত করপোরেট সাম্রাজ্যে রূপ নেয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেহেতু উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বাজারে একের পর এক প্রযুক্তি আসছে, বাজার প্রভাবিত করার সক্ষমতাও একই সময়ে একাধিক কোম্পানির কাছে গিয়ে জমা হচ্ছে। ফলে এমন একটি অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে যেখানে বাজারের প্রতিটি অংশে একটি বা দুটি বৃহৎ কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হচ্ছে। কিছু কিছু অংশে কয়েকটি দুর্বল কোম্পানি প্রান্তিকভাবে টিকে থেকে বাজারে সস্তা পণ্যের সরবরাহ দিয়ে যাচ্ছে।

একচেটিয়া মুনাফার উৎস হলো উদ্ভাবন। এ মুনাফার বৃহদাংশ তারাই নিয়ে নিচ্ছে, যারা নতুন উদ্ভাবন বাজারজাতে নিয়োজিত কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অংশের মালিক। এরা হলো এসব কোম্পানির শুরুর দিককার বিনিয়োগকারী, আর্থিক উপদেষ্টা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট; যারা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শেয়ার অত্যন্ত কম দামে কিনেছিল। উদ্ভাবন সফল হলে জনপরিসরে কোম্পানির স্টক বেচাকেনা বেড়ে যায়, মূল্যও দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর মালিকরা রাতারাতি ধনী হয়ে যায়।

বেশিরভাগ বিলিয়নেয়ার কিভাবে তৈরি হয়, তার ব্যাখ্যা এর মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। কোম্পানি যত বড় হতে থাকে, এর ঝুঁকি তত কমতে থাকে। সাধারণ জনগণও এর শেয়ার কিনতে শুরু করে, তবে অনেক বেশি দামে। একই সময়ে আবার শুরুতে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের মালিকানা অত্যন্ত ধনীদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে, আশির দশক থেকে এ ধরনের একচেটিয়া মুনাফা এবং সে মুনাফা থেকে সৃষ্ট সম্পদের মধ্য দিয়ে মার্কিন নাগরিকদের খুবই নগণ্য একটি অংশ লাভবান হতে পেরেছে।

বাজারে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে কোম্পানিগুলো যখন এসব কৌশল অবাধে ব্যবহার করতে পারে এবং ধনীরা যখন করপোরেট ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিম্ন করহারের সুবিধা নিয়ে নিজের মুনাফা সংরক্ষণে সক্ষম হয় তখন ঠিক এ ধরনের ঘটনাই ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি গিল্ডেড এইজেই (প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের যুগ) এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে। এর প্রথমটি ছিল ১৮৭০ সালে শুরু হয়ে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়টি ১৯৮১ সালে শুরু হয়ে এখনো চলছে।

ত্রিশের দশকে শুরু হওয়া নিউ ডিল এরায় (মহামন্দার কালে ক্ষয়ক্ষতি কমানো ও এর পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নেয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার বাস্তবায়নের সময়কাল) পরিস্থিতি ছিল এখনকার চেয়ে ভিন্ন। **বিশের দশকে বৈষম্য** চরমে উঠলেও, মহামন্দা বিপুল সম্পদ ধ্বংস করে অর্থনৈতিক অসমতা কমিয়েছিল এবং ধনীদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছিল। সে সময়ের ধারণা ছিল যে সম্পদে বৈষম্য মহামন্দার কারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচিত কারো কর-পরবর্তী আয়ের ওপর একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা। এ ধরনের সমতাবাদী চিন্তাভাবনা থেকে ১৯৩৬ সালে সর্বোচ্চ প্রান্তিক আয়কর হার **(নির্দিষ্ট সীমার ওপর আয়ের জন্য আরেপিত করহার)** উন্নীত করা হয়েছিল ৭৯ শতাংশে।

এরপর ১৯৪২ সালে কংগ্রেসে দেয়া বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ২৫ হাজার ডলারের বেশি (২০২৫ সালের হিসাবে ডলারে প্রায় ৫ লাখ ১০ হাজারের সমপরিমাণ) আয়ের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ প্রান্তিক আয়কর হার আরোপের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস এটিকে ২ লাখ ডলারের বেশি আয়ের জন্য ৯৪ শতাংশ হারে নির্ধারণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ষাটের দশক পর্যন্ত এ হার ৯১ শতাংশে ধরে রাখা হয়েছিল। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এ হার ছিল ৭০ শতাংশ। মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্ট মহাসংকট, নিউ ডিল অ্যান্টিট্রাস্ট ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৩৩ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক সংহতির পুনরুজ্জীবন ঘটায়। উৎসাহ পায় মার্কিন নাগরিকদের দেশপ্রেম। প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা।

নতুন গিল্ডেড এইজে ব্যক্তিমালিকানার শক্তি

বাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পদের বিপুল সঞ্চয় কীভাবে গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে? প্রথম ও প্রত্যক্ষ প্রভাব হলো ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসমতা। প্রযুক্তিগত আধিপত্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বাজার প্রভাবিত করার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় একচেটিয়াভাবে। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্ট একচেটিয়া মুনাফা বাজার থেকে আহরণ করা হয় অন্যের ওপর চাপানো ব্যয় থেকে।

সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তিবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীরা যখন ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করতে থাকে, তখন তারা শ্রম ও পুঁজির ব্যয় কমিয়ে আনে। কমিয়ে দেয়া হয় অবসরগ্রহীতা ও অন্যান্য সঞ্চয়কারীদের আয়ের প্রবাহও। এ অনুযায়ী আমার হিসাবে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে করপোরেশনগুলোর সৃষ্ট মোট আয়ের মধ্যে একচেটিয়া মুনাফার অংশ ছিল ৫ শতাংশের কম। যেখানে ২০১৯ সালে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশে। বর্তমানে এ অংশ আরো বেড়েছে।

একচেটিয়া সম্পদ হলো স্টক মূল্যের সেই অংশ যা একচেটিয়া মুনাফা দ্বারা সৃষ্ট। যেহেতু স্টকের মূল্য নির্ধারিত হয় বিনিয়োগকারীদের ভবিষ্যৎ মুনাফার প্রত্যাশার ভিত্তিতে, একচেটিয়া সম্পদ হলো শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যাশিত একচেটিয়া মুনাফার বাজার মূল্য। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটে মোট একচেটিয়া সম্পদ ছিল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, কিন্তু ২০১৯ সাল নাগাদ এটি বেড়ে ২৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় এবং বর্তমানে তা সম্ভবত ৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।

এ সম্পদের বেশিরভাগই মার্কিন আমেরিকান সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের কাছে গেছে, যা আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধিতে মূল অনুঘটকের ভূমিকা রেখেছে। ১৯৮০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু মূল্যস্ফীতি-সমন্বিত আয় বেড়েছে ৯৭ দশমিক ৩ শতাংশ। যদিও এ সময় উৎপাদন খাতের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে মাত্র ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। একেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় দশমিক ১১ শতাংশ। সাধারণত উৎপাদন খাতের শ্রমিকদের

দশমিক ৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় দশমিক ১২ শতাংশ। সাধারণত উৎপাদন খাতের শ্রমিকদের কোনো কলেজ ডিগ্রি থাকে না। এতে বোঝা যায় যে আশির দশকের পর থেকে এ পর্যন্ত ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদনশীলতা বাড়লেও স্বল্পশিক্ষিত শ্রমজীবীরা তা থেকে খুব কমই লাভবান হয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় গুরুতর রাজনৈতিক অসমতা, যা গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ন করে। কারণ ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান সম্পদ তার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই ক্ষমতা হলো অন্যের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার সামর্থ্য। যদিও ক্ষমতার উৎস বিভিন্ন হতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পদই ব্যক্তিগত ক্ষমতা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। এটি ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপানোর ক্ষমতা শুধু ভোটদানের অধিকারেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এমন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষয় করে ফেলে।

প্রথম গিল্ডেড এইজে কতিপয় 'রবার ব্যারন' প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করেছিল। **দ্বিতীয় গিল্ডেড এইজে** সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য কতিপয় মার্কিন নাগরিককে লবিং, নির্বাচনী অনুদান ও দায়িত্বশীলদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরির অর্থ ব্যয়ের হুমকি দিয়ে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়েছে। তারা নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব ফেলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি অলিগার্কিতে রূপ নিয়েছে, যার নেতৃত্বে দিচ্ছে ট্রাম্পের নিয়োগপ্রাপ্ত ধনীরা, তার অভিষেকে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বিলিয়নেয়ার এবং তাকে সমর্থন দেয়া ধনী সিইওরা।

সম্পদকে কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপ দেয়া যায়; মিরিয়াম অ্যাডেলসন, মার্ক আন্দ্রিসেন, মাইকেল ব্লুমবার্গ, ইলন মাস্ক, কোচ ভাইয়েরা, জর্জ সোরোস এবং পিটার থিয়েলের মতো ব্যক্তিরা তা প্রকাশ্যেই দেখিয়েছেন। আরো অনেক ধনী মার্কিন নিয়মিতভাবে নিজেদের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনুদান ও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার করে রাজনীতিবিদদের ওপর নিজেদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ইলন মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই) এমন লেনদেনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বিকৃত উদাহরণ মাত্র। যেহেতু এসব সম্পদের উৎস মূলত সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতা, তাই এই বিভাগটির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অসমতার মূল চালিকাশক্তি হলো বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এমন বৈষম্য সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নাগরিক অংশগ্রহণকে ক্ষয় করে এবং অনেক মধ্য ও নিম্ন আয়ের নাগরিক গণতন্ত্রের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হন।

প্রযুক্তির ভূমিকা

মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিকাঠামো ছাড়া এগুলোর কোনোটাই সম্ভব হতো না। এ ধরনের নীতিতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে এমন ধ্যানধারণারও প্রকাশ পায় যে মানুষকে নিজ কর্মের দায়িত্ব নেয়া উচিত। জনসাধারণকে সুরক্ষা জালের (সেফটি-নেট) আওতায় আনতে সরকারের গৃহীত সব ধরনের কর্মসূচিকে এ নীতি প্রত্যাখ্যান করে। অথচ প্রযুক্তির বা মুক্তবাণিজ্যের কারণে যেসব মানুষ কর্মহীন হয়েছেন, তাদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়া বা সহায়তা করার বিষয়টিও এ সুরক্ষা জাল কর্মসূচির মধ্যে পড়ে।

মার্কিন রাজনীতিবিদরা প্রায়শই আইন র‍্যান্ডের (রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখিকা ও দার্শনিক) মতো বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এর পরিণতি আবার বেশ সুদূরপ্রসারী। একটি মুক্তবাজার ও প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতি কিছু লোককে লাভবান হতে সাহায্য করে। আবার অন্যরা সে উদ্ভাবন দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ স্বনির্ভরতাভিত্তিক নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়ে। নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে বাধ্য হয় তারা। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এক ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা। এমন নীতির শিকার মানুষেরা বিষয়টিকে বিবেচনা করে অন্যায্য হিসেবে, যার প্রকৃত ফলাফল হয় একটি দুর্বল গণতন্ত্র।

এখানে মূল প্রভাবক হলো শ্রমিকদের দক্ষতার ওপর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব। বিংশ শতকের শুরুর দিকে প্রধান উদ্ভাবনী প্রযুক্তিগুলো ছিল বিদ্যুৎ ও অভ্যন্তরীণ দহন (ইন্টারনাল কম্বাশন) ইঞ্জিন। কিন্তু যে প্রযুক্তিটি সত্যিকার অর্থে আমেরিকান শিল্পায়নের সূচনা করেছিল তা হলো অ্যাসেম্বলি লাইন (র‍্যানসম ওল্ডস ১৯০১ সালে এটি উদ্ভাবন করেন এবং ১৯১৩ সালে মডেল টি গাড়ি উৎপাদন করতে গিয়ে মুভিং অ্যাসেম্বলি লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এটিকে পূর্ণতা দেন হেনরি ফোর্ড)। ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে উদ্ভাবিত এ পদ্ধতির কারণে দক্ষতানির্ভর কিছু কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এর প্রভাব আজকের প্রযুক্তিগুলোর মতো ছিল না। বরং যাদের কোনো কলেজ ডিগ্রি নেই, সেসব শ্রমিকের জন্য উচ্চ উৎপাদনশীল অনেক নতুন কর্মসংস্থান তৈরিও করেছিল।

মুভিং অ্যাসেম্বলি লাইন পদ্ধতি জটিল পরিচালন কার্যক্রমকে সহজ ও পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যক্রমে রূপ দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে উৎপাদন খরচও বেশ কমে যায়। এর হেনরি ফোর্ড এমন সব অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ দিতে পেরেছিলেন, যাদের পক্ষে এ ধরনের কাজ নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তিনি যারা অ্যাসেম্বলি লাইনের কাজ সহ্য করতে পারতেন, তাদের সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে বেশি বেতন দিয়ে পুরস্কৃত করতেন। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় 'ব্লু-কলার কর্মীর' ঐতিহ্য, যাদের কলেজের ডিগ্রি না থাকলেও 'আমেরিকান ড্রিম' অনুসরণে কোনো বাধা ছিল না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পেও ব্লু-কলার শ্রমিকদের আবির্ভাব ঘটে। যারা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিল। আবার হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ারের মতো অনেক হোয়াইট-কলার চাকরিও কাজের দিক থেকে হয়ে উঠেছিল 'পুনরাবৃত্তিমূলক'।

১৯২০ সালে মার্কিন শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ ছিল কলেজ ডিগ্রিবিহীন শ্রমিকরা। ১৯৫০ সালেও তাদের হার ছিল ৬৫ শতাংশের বেশি। তারাই হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির প্রধান সুবিধাভোগী। তারা চাকরির স্থলেই প্রশিক্ষণ পেত। সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, ছুটি কাটানো এবং প্রাণবন্ত মার্কিন শ্রমশক্তি ও দ্রুত বর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্য হিসেবে আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য তাদের আয়ও ছিল যথেষ্ট।

আইটি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন এর সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। আগের প্রযুক্তির যুগে সমৃদ্ধি অর্জন করা শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন করেছে আইটি-ভিত্তিক অটোমেশন। প্রতিস্থাপিত হয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজনির্ভর চাকরিগুলোও। অতীতের সমৃদ্ধিশালী ব্লু-কলার শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছেন কম বেতনের চাকরি নিতে। এর মধ্য দিয়ে সমাজের সক্রিয় অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে পড়েছে। অবনতি ঘটেছে পারিবারিক জীবন ও স্বাস্থ্যের। এর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এমন সব মৃত্যুর ঘটনা যাকে অ্যান কেস এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অ্যাঙ্গাস ডিটন আখ্যা দিয়েছেন 'হতাশাজনিত মৃত্যু' (আত্মহত্যা, মাদকের ওভারডোজ ও লিভারের রোগজনিত মৃত্যু) হিসেবে।

বিশ্বায়নের অন্ধকার দিক

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হারানোর পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো ১৯৮১ সাল পরবর্তী সময়ে ঘটা মুক্তবাজার বিশ্বায়ন। যদিও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এ সময় উপকৃত হয়েছে, কিন্তু কিছু গোষ্ঠীকে এর যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে, তা তাদের এর মধ্য দিয়ে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কোনোভাবেই পোষানো সম্ভব না। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য উন্মুক্তকরণের পর ১৯৯৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে মার্কিন শ্রমবাজার থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ২৪ লাখ কর্মসংস্থান।

৩৯ বছরের কমবয়সী শ্রমিকরা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারলে বেশিরভাগ বয়স্ক শ্রমিক, যাদের বিশেষায়িত দক্ষতাকে নতুন শিল্পের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়নি; তারা এ 'চায়না শক' সামলাতে পারেননি এবং শ্রমবাজার থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর এ ধরনের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কারণে চাকরি হারানোর বিষয়টি ভৌগলিকভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। এ কারণে প্রাথমিকভাবে এসব কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়ে পড়ার বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হলেও পরে তা আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষয় এবং পরে আরো কর্মসংস্থান হারানোর দিকে নিয়ে যায়। আর পরিস্থিতিকে আরো সঙীন করে তোলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলো থেকে ইউনিয়নমুক্ত দক্ষিণাঞ্চলে উৎপাদন স্থানান্তর। এর প্রভাব ছিল দীর্ঘমেয়াদী। ২০১৯ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোয় (কর্মসংস্থান পরিস্থিতির) প্রায় কোনো পুনরুদ্ধারই হয়নি।

যেসব শ্রমিকের কোনো কলেজ ডিগ্রি নেই, তাদের ওপর এসবের বিরূপ প্রভাব আগের যেকোনো সময়কে ছাড়িয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রসারিত হলেও দেশটির বেশিরভাগ শ্রমিক এ প্রবৃদ্ধির ধরন দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। মুক্তবাজার নীতি ও প্রযুক্তির হাতে ধ্বংস হয়ে পড়েছে ব্লু-কলার শ্রমিকদের গর্বিত সংস্কৃতি। আর যখন এ ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত এলিটরা এ সমস্যাকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। বাজারই এর সমাধান করবে বলে যুক্তি দিয়েছেন তারা। আর নয়তো চাকরি হারানো শ্রমিকদের পুনরায় প্রশিক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেবল মুখরোচক বক্তব্য দিয়ে গেছেন। বিষয়টি যখন এক জনতুষ্টিবাদী (পপুলিস্ট) রাজনৈতিক ঝড়ে রূপ নিল, তখন বেশিরভাগ মার্কিন, বিশেষ করে এলিটরা, হতবাক হয়ে পড়েছেন।

এসবের ফলাফল এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি— ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' (এমএজিএ) আন্দোলনের উত্থান ও গণতন্ত্রের অবনতি। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে টানা দুই প্রজন্ম ধরে উপেক্ষিত থেকে আশাহীন হয়ে পড়েছিলেন কলেজ ডিগ্রিবিহীন শ্রমিকরা। সুযোগ পাওয়া মাত্র সেসব দুর্নীতিগ্রস্ত এলিটদের তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন; যারা এসব শ্রমিকদের ক্ষতির মুখে ফেলা নীতিগুলোকে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ন্যায্যতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, গত চার দশক ধরে যা হয়েছে; সেটিকে যদি 'প্রগতি' বলা হয়, তবে এমন প্রগতির কোনো প্রয়োজন নেই।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করা মানুষের সংখ্যা অনুমান করা সহজ নয়, তবে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। আমার প্রকাশিতব্য বই 'প্রাইভেট পাওয়ার অ্যান্ড ডেমোক্রেসিস ডিক্লাইন: হাউ টু মেক ক্যাপিটালিজম সাপোর্ট ডেমোক্রেসি'-তে আমি দুটি সংখ্যা উল্লেখ করেছি। এর একটিতে বলেছি ৪ কোটি মার্কিন নাগরিকের কথা, যাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গত অর্ধশতকের কর্মসংস্থান হারানোর ঘটনায় সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিক, তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন, যাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলোর যেসব শ্রমিক একই কারণে চাকরি হারিয়েছেন, তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরাও এর মধ্যে রয়েছেন।

দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রথমটিতে অন্তর্ভুক্তদের পাশাপাশি হিসাবে নেয়া হয়েছে কলেজ ডিগ্রিবিহীন শ্রমিকদের, যারা কঠোর পরিশ্রম করেও মার্কিন সমাজের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতায় আর বিশ্বাস রাখেন না। আমার অনুমান, এ দলে ১১ কোটি মার্কিন নাগরিক রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্তরা ছাড়া বাকি ৭ কোটি হলো ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় থাকা কর্মীরা, যাদের মধ্যে তরুণরাও রয়েছে। মার্কিন শ্রমবাজারে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উচ্চমাত্রার ও ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রতিফলন তাদের মধ্যে স্পষ্ট। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এটি সামনের দিনগুলোয় শিক্ষিত কর্মীদের চাকরিকেও হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃতিনির্ভর গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির উপাদানগুলোও এসব হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (যেমন মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন বর্ণবাদী ও চরমপন্থী আন্দোলন)। এগুলো সব সময়ই ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য হওয়ায় তাদের পক্ষে কখনোই কোনো নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব না। কিন্তু যখন তারা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক শিকার হিসেবে বিবেচিত শ্রমিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়, তখন তারা বড় অনুঘটক হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করে ফেলে।

২০১৬ সালের নির্বাচনে এমএজিএ জোট গঠনের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প এটাই করেছিলেন। রাজনীতিবিদরা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও নিজেদের এজেন্ডাগুলোকে এগিয়ে নিতে এ ধরনের সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে ব্যবহার করলেও শুধু এগুলো দিয়ে এমএজিএর উত্থানকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। ২০১৬ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে সংস্কৃতিনির্ভর গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো নিঃসন্দেহে কিছু অবদান রাখলেও এর মাত্রা ছিল পুরোপুরি প্রান্তিক বা যৎসামান্য পর্যায়ের। এমএজিএকে এগিয়ে নেয়ার পেছনের মূল শক্তিটি হলো কলেজ শিক্ষাবিহীন শ্রমিকদের বৃহদাংশ, যারা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অবনতির পেছনের বিষয়গুলোর উপস্থিতি অন্যান্য দেশেও স্পষ্ট। তবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী এর ধরনে তারতম্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে গণতন্ত্র কতটা পিছিয়ে পড়বে, তা নির্ভর করে দেশগুলো বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে শ্রমিকদের খাপ খাইয়ে নেয়াতে কী মাত্রায় নীতিগত প্রয়াস নিচ্ছে তার ওপর। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জার্মানি ও জাপানে এমন নীতিগত প্রয়াসের স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়।

গণতন্ত্রের সুরক্ষা

আমরা গণতন্ত্র বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতি বেছে নিতে পারি। কিন্তু দুটোই একসঙ্গে সম্ভব না। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। প্রথমটি হলো ব্যক্তিগত ক্ষমতা দমন করা এবং চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসমতা দূর করা, যা যুক্তরাষ্ট্রকে একটি অলিগার্কিতে পরিণত করেছে। দ্বিতীয়টি হলো উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমানভাবে বণ্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করা, যাতে কোনো গোষ্ঠী পিছিয়ে না থাকে এবং অন্যেরা যে সুবিধা ভোগ করছে তার মূল্য তাদের পরিশোধ না করতে হয়।

সুসংবাদ হলো, ক্রমবর্ধমান বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং এর সাথে যুক্ত উচ্চ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসমতা কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। নীতিগত সংস্কার এটিকে উল্টে দিতে পারে। নিউ ডিল এরা আমাদের দেখিয়েছে যে

শেরম্যান অ্যান্টিট্রাস্ট শাস্তি ও এর প্রয়োগ বড় কোম্পানিগুলোকে ছোটদের অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। এবং অ্যান্টিট্রাস্ট ও কর নীতির সমন্বয় বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

ব্যক্তিগত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে পাঁচটি প্রয়োজনীয় সংস্কারে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হলো শেরম্যান অ্যান্টিট্রাস্ট অ্যাক্টকে এমনভাবে হালনাগাদ করা, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে সরকারি নীতির লক্ষ্য হলো উদ্ভাবনের সুফলগুলোকে সংরক্ষিত রেখেই বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমান অ্যান্টিট্রাস্ট নীতির প্রয়োগকে বিঘ্নিত করছে এর উদ্দেশ্য নিয়ে চলমান আইনি দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয়ত, অধিগ্রহণের উপর বিধিনিষেধ কঠোর করার মাধ্যমে প্রযুক্তির কেন্দ্রীভবন (টেকনোলজিক্যাল কনসেনট্রেশন) রোধ করতে হবে। পণ্য বিপণনের মতোই প্রযুক্তির কেন্দ্রীভবনও একচেটিয়া আধিপত্যের দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি আকার অর্জনের পর অধিগ্রহণ নিষিদ্ধ করা উচিত। কারণ তা প্রযুক্তির কেন্দ্রীভবনকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

তৃতীয়ত, পেটেন্ট আইন সংস্কার করা উচিত যাতে কোম্পানিগুলো বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতা গড়ে তোলার কৌশল হিসেবে বৌদ্ধিক সম্পদ সুরক্ষাকে (ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রোটেকশন) ব্যবহার করতে না পারে। আমাদের পেটেন্টের জন্য নতুনত্বের শর্তকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রকৃত উদ্ভাবনী প্রাথমিক পেটেন্টের সঙ্গে এগুলোর ওপর নির্ভরশীল গৌণ পেটেন্টগুলোর পার্থক্যকে আরো স্পষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে গৌণ পেটেন্টের সুরক্ষা শুধু প্রাথমিক পেটেন্টের অর্ধেক সময়ের জন্য কার্যকর করা উচিত।

চতুর্থত, করকে ব্যক্তির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে হবে। করপোরেট আয়কর হার বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করা উচিত, এবং সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত প্রান্তিক আয়কর (যারা বছরে ১০ লাখ ডলারের বেশি আয় করেন, তাদের জন্য) বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করা উচিত।

সবশেষে নীতিনির্ধারকদের উচিত ইউনিয়ন গঠনের ওপর আরোপিত আইনি বিধিনিষেধ দূর করা। পাশাপাশি দুর্নীতি রোধ করতে ইউনিয়নের আর্থিক হিসাব ও সুশাসন নিয়ে সরকারিভাবে কঠোর নিরীক্ষা চালানো বাধ্যতামূলক করা। যেহেতু ইউনিয়ন কর্মীদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে এবং বাজার প্রভাবিত করার ক্ষমতায় ভারসাম্য বাড়াতে সহায়তা করে, সেহেতু এটি কেউ যাতে পিছিয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।

এটি আমাদেরকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দ্বিতীয় উপাদানের দিকে নিয়ে যায়। সেটি হলো প্রযুক্তি ও উন্নয়নের সুবিধার আরো সুষম বণ্টন। এর অর্থ হলো, যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবন ও প্রবৃদ্ধি নিয়ে নতুন একটি নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে যা নিশ্চিত করবে যে প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তন বিপুল সংখ্যক মানুষকে জীবিকাহীন করবে না। প্রচলিত মুক্তবাজার পদ্ধতি এমন ফলাফলকেই উৎসাহিত করছে। অথচ নীতিনির্ধারকদের উচিত বিজয়ীদের লাভের কিছু ভাগ যাতে ক্ষতিগ্রস্তরাও পায় তা নিশ্চিত করা।

সমাধানগুলোকে আবারো ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করতে পারি। শুরুতে, ফেডারেল ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে ১৫ ডলার (ঘণ্টায়) করতে হবে এবং এটিকে ভোক্তা মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত 'জীবিকা পুনরুদ্ধারের অধিকার' নিশ্চিতে একটি ফেডারেল নীতিমালা গঠন করা। এ ধরনের নীতির অর্থ হলো, সরকারি নীতিমালায় সমর্থিত কোনো অর্থনৈতিক বা বাজার উন্নয়নের কারণে কর্মচ্যুত ব্যক্তি ও জীবিকা পুনরুদ্ধারের নিশ্চয়তা দেয়া।

এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গভাবে ভর্তুকিনির্ভর পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, অবসর তহবিল (যদি পুনঃপ্রশিক্ষণ সম্ভব না হয়), প্রশিক্ষণকালে কর্মক্ষেত্রে যেতে না পারায় হারানো মজুরির অর্থপ্রদান, পেশা পরিবর্তনকালীন চিকিৎসা সেবা, প্রয়োজনে স্থানান্তর খরচ এবং পারিবারিক জীবন বজায় রাখতে সামাজিক সেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জার্মানি ও জাপানে এ ধরনের নীতিই মানদণ্ড, যদিও দেশভেদে তার ধরনে ভিন্নতা আছে। এ কর্মসূচি অর্থায়ন করা হবে নতুন প্রবর্তিত পণ্য ও প্রযুক্তির ওপর কর আরোপের মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সহজে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এআইভিত্তিক পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে ভর্তুকি প্রদান করা, যাতে কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই আরো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমেও কলেজ ডিগ্রিবিহীন কর্মীদের জন্য ভালো চাকরির সুযোগ বাড়ানো সম্ভব। এজন্য ট্রেড স্কুল, কমিউনিটি কলেজ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন।

শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। সমসাময়িক ও আসন্ন প্রযুক্তিগুলোর জটিল ধরনের প্রেক্ষাপটে এ সহযোগিতা আরো গঠনমূলক হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। করের মাধ্যমে অর্থায়নকৃত জীবিকা পুনরুদ্ধারের নীতি থাকলে কোম্পানিগুলো তাদের প্রযুক্তি ও শ্রমশক্তি সমন্বয়ের স্বাধীনতা পাবে, আর এই অর্থনৈতিক নমনীয়তা শেষ পর্যন্ত চাকরিদাতা ও কর্মী উভয়ের জন্যই লাভজনক হবে।

ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ্য বেআইনী কার্যক্রমে মার্কিন নাগরিকদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জের জরুরি পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ অলিগার্কি এখন যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার নিয়ন্ত্রণকে দৃঢ় করছে। আমরা যদি একটি ন্যায্য গণতান্ত্রিক সমাজ চাই, তবে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও এটিকে শক্তিশালী করে তোলা একচেটিয়া মুনাফার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সত্যি বলতে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সক্ষম একটি জোটের ক্ষমতায়নের জন্য এমন অনেক কিছুই বদলাতে হবে। কিন্তু এ পরিবর্তন এখন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন সেসব শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন ঘটাবে না, যারা তাকে ক্ষমতায় এনেছে।

— মর্ডিকাই কুর্জ; স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ইমেরিটাস অধ্যাপক, 'দ্য মার্কেট পাওয়ার অব টেকনোলজি: আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সেকেন্ড গিল্ডেড এইজ' (কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২৩) এবং "প্রাইভেট পাওয়ার অ্যান্ড ডেমোক্রেসিস ডিক্লাইন: হাউ টু মেক ক্যাপিটালিজম সাপোর্ট ডেমোক্রেসি" (এমআইটি প্রেস, ২০২৬) গ্রন্থের লেখক।

ভাষান্তর: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

আরও

অভিমত

আমাদের নদী, আমাদের জীবনরেখা

নদী সংকট আসলে পরিবেশগত ও মানবিক—দুটোই। এক সময়ের ইলিশ, মহাশোল, বাঘাইর, রুই, কাতলার মোহনীয় ভাণ্ডার আ...

৫ জুন, ২০২৫

অভিমত

প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে আর্থিক খাতের দায়

প্লাস্টিক এখন শুধু শহরের ড্রেন বা সাগরের পাড়েই নয়, মানুষের খাদ্যচক্রে, এমনকি রক্ত ও হৃৎপিণ্ডে জায়গা করে নিচ্ছে। ২০২৫...

৫ জুন, ২০২৫

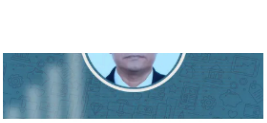

অভিমত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য নির্বাচন: একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ

প্লাস্টিক একটি কৃত্রিম বস্তু, যা আবিষ্কারের পর এর বহুমুখী ব্যবহারের জন্য মানুষের মধ্যে তৈরি হয় ব্যাপক আগ্রহ। দীর্ঘস্থায়ী, ওজনে...

৫ জুন, ২০২৫

পরিবেশ-প্রতিবেশ • **টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশের চাই প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ**

প্রতি বছরের মতো এবারো ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হচ্ছে। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'প্লাস্টিক...

৪ জুন, ২০২৫

পবিত্র ঈদুল আজহা • **জনমনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা হোক এ ত্যাগের উৎসবের অঙ্গীকার**

মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। ত্যাগের মধ্যেও যে আনন্দ আছে, সেটাই ঈদুল আজহার শিক্ষা।...

৪ জুন, ২০২৫

বিশ্ব পরিবেশ দিবস • **প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করার এখনই সময়**

আমাদের আবাস এ পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশ নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের এ...

৪ জুন, ২০২৫

বণিক বার্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ: পিএবিএক্স: ৫৫০১৯৩০১-০৬, ই-মেইল: news@bonikbarta.com, onlinenews@bonikbarta.com (অনলাইন)
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ: ফোন: ৫৫০১৯৩০৮-১৪, ফ্যাক্স: ৫৫০১৯৩১৫